গো-খাদ্য হিসেবে এ্যালজি উৎপাদন ও ব্যবহার

ভূমিকা

আদিমকাল থেকে মানুষ খাদ্যের বিকল্প উৎসের সন্ধান করে আসছে। প্রকৃতির ভান্ডারে খাদ্যের অফুরন্ত উৎসের অনেক খনিই আমাদের চোখের আড়ালে রয়ে গেছে। এ কথা মানুষের ক্ষেত্রে যেমন সত্য, পশুপাখির ক্ষেত্রেও তাই। পশুপাখির ক্ষেত্রে মানুষকে সে উৎসের সন্ধান জানিয়ে দিতে হয়। অ্যালজি তেমনি প্রকৃতির ভান্ডারের একটি সম্ভাবনাময় খাদ্য যা আমরা পশুখাদ্য হিসেবে ব্যবহার করতে পারি।

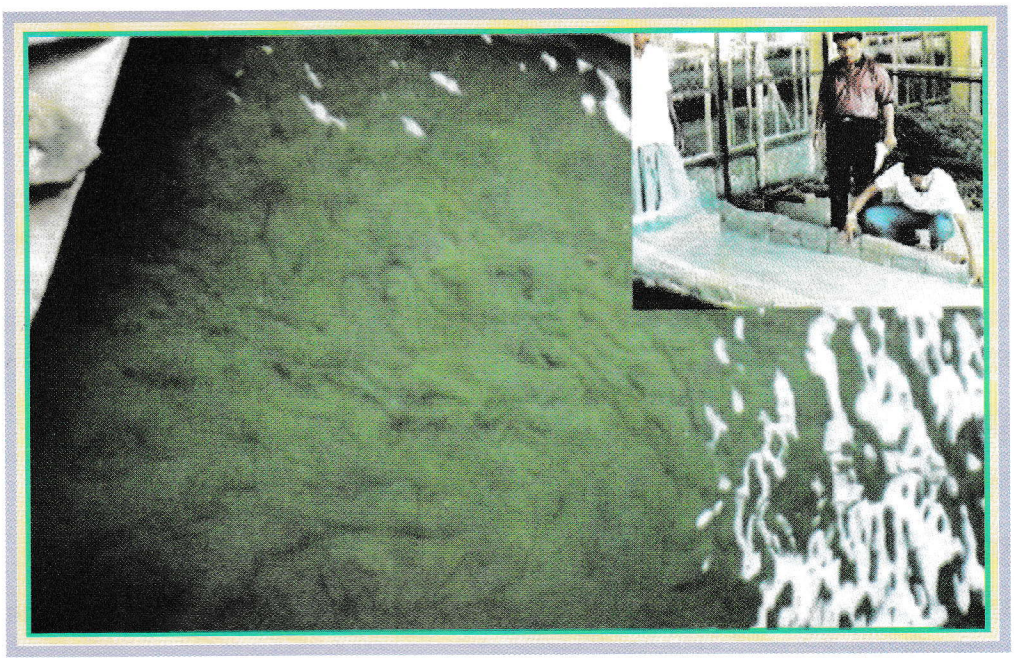

অ্যালজি কি

অ্যালজি এক ধরনের উদ্ভিদ যা আকারে এককোষী থেকে বহুকোষী বিশাল বৃক্ষের মতো হতে পারে। তবে আমরা এখানে দুটি বিশেষ প্রজাতির এককোষী এ্যালজির কথা উল্লেখ করবো, যা গো-খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা যাবে। এগুলো হলো ক্লোরেলা এবং সিনেডে সমাস। এরা সূর্যালোক, পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেন, কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জৈব নাইট্রোজেন আহরণ করে সালোক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় বেঁচে থাকে। এরা অত্যন্ত দ্রুত বর্ধনশীল বিশেষ করে বাংলাদেশের মত উষ্ণ জল বায়ুতে। পঞ্চাশ দশকের শেষের দিকে জাপানে আমিষ এবং চর্বির উৎস হিসেবে এক কোষী এ্যালজির চাষ বাণিজ্যিক ভিত্তিতে শুরু হয়। পরবর্তীতে তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নসহ পূর্ব ইউরোপের বিভিন্ন দেশে এর বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হয়। তবে এসব ক্ষেত্রে অ্যালজির উৎপাদন পদ্ধতি ছিল অত্যন্ত ব্যয় বহুল। এ দেশে, বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদের (বি সি এস আই আর) বিজ্ঞানী মিসেস মোমেনা খাতুন ঢাকায় বিভিন্ন পুকুর থেকে পানি সংগ্রহ করে তা থেকে ক্লোরেলা ও সিনেডেসমাস আলাদা করেন। পরবর্তীতে তিনি ও তার সহযোগীরা বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক

মিডিয়াতে অ্যালজি উৎপাদনের পদ্ধতির ওপর গবেষণা চালান। এসব মিডিয়ায় অ্যালজির ভাল উৎপাদন হলেও এর উৎপাদন ছিল অত্যন্ত ব্যয়বহুল এবং মিডিয়া থেকে অ্যালজিকে আলাদা করে তারপর ব্যবহার করতে হতো। তাই তাঁরা বিভিন্ন ধরনের ডালের ভুসি, মোটরের ছোবড়া, কাউপি ইত্যাদি ব্যবহার করে গবেষণাগারে অ্যালজি উৎপাদনের চেষ্টা করেন। এতে দেখা যায় ডালের ভুসি ব্যবহার করে অ্যালজি উৎপাদন সম্ভব, যা সহজলভ্য এবং সরাসরি ব্যবহার করা যায়। এ পর্যায়ে বাংলাদেশ পশুসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বি এল আর আই) এর বিজ্ঞানী এবং বি সি এস আই আর এর বিজ্ঞানীগণ যৌথভাবে গবেষণা চালিয়ে খামার পর্যায়ে অ্যালজির উৎপাদন এবং পশুখাদ্য হিসেবে এর উপযোগিতা নির্ণয় করেন। উদ্ভাবিত উৎপাদন ও ব্যবহার পদ্ধতিগুলো নিম্নে আলোচনা করা হলো।

অ্যালজির পুষ্টি মান

বিভিন্ন ধরনের অপ্রচলিত খাদ্যের মধ্যে অ্যালজি অত্যন্ত সম্ভাবনাময় পুষ্টিকর খাদ্য যা বিভিন্ন ধরনের আমিষ জাতীয় খাদ্য যেমন- খৈল, শুটকি মাছের গুঁড়া ইত্যাদির বিকল্প হিসেবে ব্যবহার হতে পারে। শুষ্ক অ্যালজিতে শতকরা ৫০-৭০ ভাগ আমিষ বা প্রোটিন, ২০-২২ ভাগ চর্বি এবং ৮-২৬ ভাগ শর্করা থাকে। এছাড়াও অ্যালজিতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সিএবং বিভিন্ন ধরনের বি ভিটামিন থাকে। কেবলমাত্র "সিসটিন" ছাড়া এ্যালজির প্রোটিনে বিভিন্ন ধরনের অ্যামাইনো এসিডের অনুপাত প্রায় ডিমের প্রোটিনের সমান। রোমন্থনকারী প্রাণীতে (যেমন গরু, মহিষ, ছাগল ও ভেড়া) অ্যালজির প্রোটিনের পাচ্যতা ৭৩%।

অ্যালজির উৎপাদন পদ্ধতি

নিম্নে উৎপাদন পদ্ধতিটি সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো।

অ্যালজি চাষের প্রয়োজনীয় উপকরণ

অ্যালজির বীজ, কৃত্রিম অগভীর পুকুর, টিউবওয়েলের পরিষ্কার স্বচ্ছ পানি, মাষকালাই বা অন্যান্য ডালের ভুসি এবং ইউরিয়া।

* প্রথমে তৈরি করতে হবে সমতল, ছায়াযুক্ত জায়গায় একটি কৃত্রিম পুকুর। পুকুরটি লম্বায় ১০ ফুট, চওড়ায় ৪ফুট এবং গভীরতায় ১/২ ফুট হতে পারে। পুকুরের পাড় ইট বা মাটির তৈরি হতে পারে। এবার ১১ ফুট লম্বা,৫ ফুট চওড়া একটি স্বচ্ছ পলিথিন বিছিয়ে কৃত্রিম পুকুরের তলা ও পাড় ঢেকে দিতে হবে। তবে পুকুরের আয়তন প্রয়োজন অনুসারে ছোট বা বড় হতে পারে। তাছাড়া মাটির বা সিমেন্টের চাড়িতেও অ্যালজি চাষ করা যায়।

* ১০০ গ্রাম মাসকালাই (বা অন্য ডালের) ভুসিকে ১ লিটার পানিতে সারারাত ভিজিয়ে কাপড় দিয়ে ছেঁকে পানিটুকু সংগ্রহ করতে হবে। একই ভূষিকে অন্তত তিনবার ব্যবহার করা যায়, যা পরবর্তীতে গরুকে খাওয়ানো যায়।

* এবার কৃত্রিম পুকুরে ২০০ লিটার পরিমাণ কলের পরিষ্কার পানি, ১৫-২০ লিটার পরিমাণ অ্যালজির বীজ, যা অ্যালজির ঘনত্বের ওপর নির্ভর করে এবং মাষকালাই ভূসি ভেজানো পানি নিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে। এরপর ২-৩ গ্রাম পরিমাণ ইউরিয়া নিয়ে উক্ত পুকুরের পানিতে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে।

* এরপর প্রতিদিন সকাল, দুপুর, বিকেলে কমপক্ষে তিনবার উক্ত অ্যালজির কালচারকে নেড়ে দিতে হয়। পানির পরিমাণ কমে গেলে নতুন করে পরিমাণ মতো পরিষ্কার পানি যোগ করতে হয়। প্রতি ৩/৪ দিন পর পর পুকুরপ্রতি ১-২ গ্রাম পরিমাণ ইউরিয়া ছিটালে ফলন ভালো হয়।

* এভাবে উৎপাদনের ১২-১৫ দিনের মধ্যে অ্যালজির পানি গরুকে খাওয়ানোর উপযুক্ত হয়। এ সময় অ্যালজির পানির রঙ গাঢ় সবুজ বর্ণের হয়। অ্যালজির পানিকে পুকুর থেকে সংগ্রহ করে সরাসরি গরুকে খাওয়ানো যায়।

* একটি পুকুরের অ্যালজির পানি খাওয়ানোর পর উক্ত পুকুরে আগের নিয়ম অনুযায়ী পরিমাণ মতো পানি, সার এবং মাষকালাই ভূষি ভেজানো পানি দিয়ে নতুন করে এ্যালজি কালচার শুরু করা যায়, এ সময় নতুন করে অ্যালজি বীজ দিতে হয় না।

* যখন অ্যালজি পুকুরে পানির রঙ স্বাভাবিক গাঢ় সবুজ রঙ থেকে বাদামি রঙ হয়ে যায় তখন বুঝতে হবে যে উক্ত কালচারটি কোনো কারণে নষ্ট হয়ে গেছে। এ ক্ষেত্রে নতুন করে কালচার শুরু করতে হবে। এ কারণে অ্যালজি উৎপাদনের ক্ষেত্রে নিম্নে বর্ণিত সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত।

সাবধানতা

১. অ্যালজির পুকুরটি সরাসরি সূর্যালোকের নিচে না করে ছায়াযুক্ত স্থানে করা উচিত। কারণ অতি আলোকে অ্যালজি কোষের "ফোটো অক্সিডেটিভ ডেথ" হয়। অর্থাৎ অ্যালজি কোষের মৃত্যু হয়। এ জন্য কালচারটি নষ্ট হয়ে যায়।

২. কখনোই মাষকালাই ভূসি ভেজানো পানি বর্ণিত পরিমাণের চেয়ে বেশি দেয়া উচিত নয়, এতেও "নিউট্রেন্টসুপার সেচুরেশন" এর কারণে এ্যালজি কোষ মারা যেতে পারে।

৩. অ্যালজি পুকুরের পানিকে নাড়া না দিলে কোষের ওপর কোষ থিতিয়ে কালচারটি নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

৪. যদি কখনো অ্যালজি পুকুরের পানি গাঢ় সবুজ রঙের পরিবর্তে হাল্‌কা নীল রঙ ধারণ করে তখন তা ফেলে দিয়ে নতুন করে কালচার শুরু করতে হবে। কারণ নীলবর্ণের অ্যালজি ভিন্ন প্রজাতির বিষাক্ত অ্যালজি যা ক্লোরেলা ও সিনেডে সমাস থেকে ভিন্ন।

ফলন ও খরচ

উপরোক্ত নিয়মে অ্যালজি উৎপাদন করলে প্রতি ১০ বর্গ মিটার পুকুর থেকে প্রতিদিন প্রায় ৫০ লিটার অ্যালজির পানি বা ১৫০ গ্রাম শুষ্ক অ্যালজি উৎপাদন সম্ভব। এ হিসাবে এক বছরে উপরোক্ত আয়তনের পুকর থেকে প্রায় ১৭.৫ টন এ্যালজির পানি উৎপাদন সম্ভব। উপাদানসামগ্রীর দাম অনুসারে প্রতি লিটার অ্যালজির উৎপাদন করতে সর্বোচ্চ পাঁচ পয়সা খরচ পড়তে পারে। নিম্নে অ্যালজি এবং প্রচলিত বিভিন্ন ঘাসের হেক্টর প্রতি উৎপাদন এবং খরচ দেখানো হলো।

সারণি-১ ঃ অ্যালজি ও বিভিন্ন ঘাসের হেক্টর প্রতি বার্ষিক উৎপাদন ও খরচ

ঘাসের নাম	উৎপাদন (টন)	খরচ (টাকা, প্রতি কেজি)
ভুট্টা	৮০-৯০	০.৬৬
নেপিয়ার	২০০-২৫০	০.২৬
পারা (নিচু জমি)	১০০-১৫০	০.২৭
ওট	৫৪	০.২৪
এ্যালজি পানি	১৮২৫০	০.০৫

সবচেয়ে বড় সুবিধা এই যে, অ্যালজি উৎপাদন করতে কোনো আবাদি জমির প্রয়োজন হয় না। বাড়িতে যে কোনো ছায়াযুক্ত সমতল স্থানে এমনকি ঘরের ভেতরে বা দালানের ছাদেও চাষ করা যায়।

গরুকে অ্যালজি খাওয়ানো

অ্যালজির পানি সব ধরনের এবং সব বয়সের গরুকে অর্থাৎ বাছুর, বাড়ন্ত গরু, দুধের বা গর্ভবতী গাভী, হালের বলদ সবাইকেই অ্যালজি খাওয়ানো যায়। অ্যালজি খাওয়ানোর কোনো ধরা বাধা নিয়ম নেই। এটাকে সাধারণ পানির পরিবর্তে সরাসরি খাওয়ানো যায়। এ ক্ষেত্রে গরুকে আলাদা করে পানি খাওয়ানোর প্রয়োজন নেই। দানাদার খাদ্য অথবা খড়ের সাথে মিশিয়েও খাওয়ানো যায়। সাধারণত দুই-এক দিনের মধ্যেই গরু এতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। গরু সাধারণত তার ওজনের ৮ ভাগ অর্থাৎ ১৫০ কেজি ওজনের গরু ১২ কেজি পরিমাণ অ্যালজির পানি পান করে। তবে গরমের দিনে এর পরিমাণ বাড়তে পারে। অ্যালজির পানিকে গরম করে খাওয়ানো উচিত নয়, এতে অ্যালজির খাদ্যমান নষ্ট হতে পারে। যদি বেশি গরু থাকে (যেমন ধরুন ৫টি গরু আছে)। এ ক্ষেত্রে অন্তত পূর্বে বর্ণিত আকারের ৫টি কৃত্রিম পুকুরে অ্যালজি চাষ করা উচিত যাতে একটির অ্যালজির পানি শেষ হতে পরবর্তীটি খাওয়ানোর উপযুক্ত হয়।

অ্যালজি খাওয়ানোর উপকারিতা

রোমন্থনকারী প্রাণী যেমন গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া যে খড় বা ঘাস ইত্যাদি খেয়ে থাকে তা পাকস্থলীর জীবাণু দ্বারা ভেঙ্গে হজম হয়। এই জীবাণুর পরিমাণ এবং কার্যক্রম খাদ্যের ওপর নির্ভর করে। যদি ভালোমানের খাদ্য অর্থাৎ পরিমাণ মতো প্রোটিন, সহজপাচ্য কার্বোহাইড্রেট, ভিটামিন এবং খনিজ যুক্ত খাবার খায় তাহলে এই জীবাণুর পরিমাণ ও কার্যক্রম বেড়ে যায় তথা গরুতে প্রোটিন এবং বিপাকীয় শক্তির সরবরাহ বেড়ে যায়। আবার যদি নিম্নমানের খাদ্য যেমন- খড় খায় তবে গরু তার চাহিদা মত বিপাকীয় শক্তি ও প্রোটিন পায় না। তাই শুধু খড় খাওয়ালে গরুর উৎপাদন কমে যায়। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, অ্যালজিতে প্রচুর প্রোটিন, ভিটামিন, শর্করা রয়েছে। বি এল আর আই-এর এক গবেষণায় দেখা গেছে যে, খড়ের সাথে সাধারণ পানির পরিবর্তে অ্যালজির পানি খাওয়ালে বাড়ন্ত গরুর মাইক্রোবিয়াল প্রোটিন সরবরাহ বেড়ে যায় এবং গরুর দৈহিক ওজন হ্রাস অনেক কমে যায়। আমাদের দেশে প্রায় সারা বছরই কাঁচা ঘাসের অভাব প্রকট।

বিশেষ করে শহর এলাকায় এ সমস্যা তীব্র। এর ফলে গরুর ভিটামিন এবং খনিজের অভাবজনিত রোগ যেমন-অন্ধত্ব, রাতকানা, গাভীর অনুর্বরতা ইত্যাদি দেখা যায়। যেহেতু অ্যালজিতে প্রচুর পরিমাণে বিভিন্ন ভিটামিন এবং খনিজ থাকে, তাই অ্যালজি খাওয়ানোর ফলে গরুকে এসব পুষ্টির অভাবজনিত রোগ থেকে রক্ষা করা যায়। বি এল আর আই-তে প্রাপ্ত ফলাফল থেকে দেখা যায় যে, অ্যালজি খাওয়ানোর কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নেই।

উপসংহার

আমাদের দেশে গরুর প্রধান খাদ্য খড়। তাছাড়া প্রোটিন এবং ভিটামিনসমৃদ্ধ খাবারের অপ্রতুলতা এবং দুর্মূল্যের কারণে সবাই এসব খাদ্য গরুকে খাওয়াতে পারেন না। ফলে গরুর উৎপাদন দিন দিন কমে যাচ্ছে। এমতাবস্থায় অ্যালজির পানি ব্যবহার করে গরুর মাংস এবং দুধ উৎপাদন সম্ভব, যা দারিদ্র্যবিমোচন এবং আত্মকর্মসংস্থানে কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারে। এছাড়াও অ্যালজি বাতাসের কার্বন-ডাই-অক্সাইড শোষণ করে এবং অক্সিজেন ত্যাগ করে, প্রতি গ্রাম অ্যালজি প্রায় ১.৬ গ্রাম অক্সিজেন উৎপাদন করে। এভাবে অ্যালজি উৎপাদনের মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করাও সম্ভব।

প্রযুক্তির উদ্ভাবক ঃ ড. শরীফ আহম্মদ চৌধুরী ও ড. খান শহীদুল হক